Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 77 – 88
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

নির্বাচিত গল্পের আলোকে প্রচেত গুপ্তের হাস্যরসাত্মক গল্পের স্বরূপ-সন্ধান

সুবিনয় দাস
গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : subinoy.das452@gmail.com

Keyword
হাস্যরস, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, প্রচেত গুপ্ত, হিউমারধর্মীগল্প, উইট, নির্মল হাস্যরসাত্মক্ গল্প, তুলনামূলক আলোচনা।

Abstract
মানব জীবনের অন্যতম প্রবৃত্তি হাস্যকে কেন্দ্র করে বহু তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। হাসির সংজ্ঞা, শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, হাসির কারণ, প্রভাব, মনস্তত্ত্ব, সামাজিকতা ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গ সেখানে স্থান পেয়েছে। এই বহুমাত্রিকতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাসির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সাহিত্যিকরাও হসিকে অবলম্বন করে তাঁদের সৃষ্টিকর্মে হাস্যরস পরিবেশন করে পাঠককে আনন্দ প্রদান করেছেন। এই হাস্যরসকে কেন্দ্র করেও তাত্ত্বিকদের আলোচনা জমে উঠেছে-- প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে। বলাবাহুল্য হাস্যরসাত্মক সাহিত্যবিচারে তার মূল্য অনস্বীকার্য। বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টি পর্ব থেকেই রচনার মধ্যে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়— প্রাচীন-মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে তা আরও বলিষ্ঠ রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। ঈশ্বরগুপ্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, সুকুমার রায়, শিব্রাম চক্রবর্তী প্রমুখ বহু সাহিত্যিকের রচনায় হাস্যরসের দ্যুতি লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য এদের সাহিত্য রচনার সময়কাল উনিশ থেকে বিশ শতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে এই ধারাটির হাল হকিকত অনুসন্ধান করতে গিয়ে যাদের নাম উঠে আসে কথাসাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজেই কিছু হাস্যরসাত্মক গল্পের সঙ্গে বিভিন্ন গল্পগ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা হাসির গল্প বেছে নিয়ে 'বাছাই করা হাসি' নামে একটি হাস্যরসাত্মক গল্পের সংকলন প্রকাশ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে তাঁর হাস্যরস রসিকতার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম গল্প 'বসন্ত জাগ্রত কাকে' একটি হিউমারধর্মী রচনা। সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক-বিত্তবান মানুষের ঘুষ খাওয়া এবং বিপদে পড়ে নাকানিচোবানি খেয়ে অনুশোচনার জাগরণের মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের আর্থ-সমাজসচেতন মানসিকতা এবং হাস্যরসের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করবার বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ করা যায়। আবার তাঁর 'মানুষ চেনা কঠিন' গল্পে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। নৈতিক চরিত্রের অসঙ্গতি লেখক বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে প্রকাশ করেছেন। তেমনি আবার 'রুটি', 'রাজার পার্ট', 'ভূদের স্যারের ভুল' এবং 'নাটক' ইত্যাদি গল্পগুলির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে অবলম্বন করে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন যার মধ্যে

রয়েছে নিছকই মজা-নির্মল আনন্দ। উক্ত গল্পগুলির নিরিখে দেখা যায়, ব্যঙ্গধর্মী আক্রমণাত্মক প্রবণতা লেখকের বৈশিষ্ট্য নয়--হাস্যরস পরিবেশনে তিনি পূর্ববর্তী প্রভাতকুমার, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়েরই ধারানুসারী। সময়, রুচি এবং যুগের বদলের সঙ্গে সঙ্গে রচনার স্থান-কাল-পাত্র বদলে গিয়ে নতুন যুগের সামাজিক, ব্যক্তিক অসঙ্গতি তাঁর রচনায় স্থান করে নিয়েছে। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

Discussion

মানুষের আদিম সনাতন প্রবৃত্তিগুলির অন্যতম হল হাস্য। মানব মনে হাস্যের জন্ম, আর অভিব্যক্তি দেহে। জন্মের বেশ কিছুদিনের মধ্যেই শিশুর মধ্যে হাস্যের অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর 'The Physiology of Laughter' নামক প্রবন্ধে হাস্যের দেহতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, কোন হাস্যময় অনুভূতি শিরা এবং তৎসংযুক্ত পেশীসমূহে সঞ্চারিত হয়ে পেশীকম্পন এবং সঞ্চালনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে থাকে, তবে বিষাদ সূচক অনুভূতি হাস্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ।[১] হাস্যের প্রকাশে বাগযন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভরতমুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে ছয় প্রকার হাসির উল্লেখ করেছেন।[২] স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত এবং অতিহসিত এই ছয় প্রকার হাস্যের প্রকৃতি এবং সামাজিক সম্পর্কসূত্র নির্দেশ করেছেন। ইংরেজিতে স্বল্পহাসি Smile এবং উচ্চহাসি Laughter এর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। হাস্যতাত্ত্বিকেরা হাস্যময় অনুভূতির সূক্ষাতিসূক্ষ্ম কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, তবু বলা চলে কোন ঘটনা, বিষয়, অথবা চরিত্রের অসঙ্গতি, ত্রুটি, দুর্বলতা হাস্যের উদ্রেক করে। কিন্তু আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের নিমিত্ত অপরের দুর্বলতা দেখেও মানুষ হেসে থাকে।

বাস্তব হাস্যকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যে হাস্যরসের অবতারণা। বলা চলে জীবনের হাসি আর সাহিত্যের হাসি এক নয়। প্রাচ্য অলংকার শাস্ত্রে রসের আলোচনা প্রসঙ্গে হাস্যরসের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। রসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আচার্য ভরত বলেছেন,

> "ন হি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে।
> তত্র বিভাবানুভাব ব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তি।"[৩]

আলোচ্য উদ্ধৃতিটিতে ভাবের উল্লেখ না থাকলেও রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ভরতমুনি ভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাবের সংযোগের কথাই বলতে চেয়েছেন। আলংকারিকেরা মোট নটি ভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন কিন্তু ভরতমুনি কর্তৃক প্রদত্ত তালিকায় স্থায়ীভাবের সংখ্যা আট। শমকে তিনি স্থায়ীভাবরূপে স্বীকার করেননি। হাস্যকে সকলেই একটি স্থায়ীভাবরূপে মেনে নিয়েছেন। ভরতমুনি বলেছেন,

> "অথ হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্মকঃ।"[৪]

আবার বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণে' বলেছেন,

> "বিকৃতাকার বাগ্ বেশ চেষ্টাদেঃ কুহাড্ভবেৎ। হাসো হাস্য স্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ।"[৫]

তাই হাস্যরসের সংজ্ঞায় উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, লৌকিক হাস্য যখন সাহিত্যে বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সঙ্গে মিশে তা বারবার কাব্য পাঠ জনিত পরিশীলিত পাঠকের হৃদয়ে যে আনন্দজনক অনুভূতি সৃষ্টি করে তাকেই হাস্যরস বলা যেতে পারে। প্রাচ্য আলংকারিকদের হাস্যকে স্থায়ীভাব রূপে দেখানোয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যলোক' গ্রন্থে। পাশ্চাত্যে হাস্যরসের ধারণাগুলি ব্যাপক। হাস্যরসের ধারণাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— হিউমার, উইট, স্যাটায়ার, ফান, গ্রটেস্ক ইত্যাদি। যে হাসিতে প্রবল উচ্ছ্বাস নেই, যা মৃদু, স্মিত অথচ হাসির সময় বেদনায় অন্তর ভারাক্লান্ত হয়ে যায়— প্রবল করুণা ও সহানুভূতিতে হৃদয় আলোড়িত হয় তাই হিউমার বা করুণ হাস্যরস। হিউমার স্রষ্টা এক উদার সহানুভূতির চোখে জগৎকে প্রত্যক্ষ করেন। তাই তাঁর হসির অন্তরালে মিশে থাকে বেদনার ফল্গুধারা। অন্যদিকে উইটের আবেদন আমাদের বুদ্ধির কাছে। কোন বিষয়কে লেখক এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেখানে বুদ্ধির খেলা থাকে— বিশেষ বোধের মাধ্যমে পাঠক তাকে আবিষ্কার করেন তখনই হাস্য তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে- এই হল উইটের জগৎ। অন্যদিকে কোন দোষ, অসঙ্গতিকে যখন লেখক নিষ্ঠুরভাবে

সকলের সামনে উন্মোচিত করেন, তখন তাঁর কশাঘাতে যে হাসি উদ্রেক হয় তা ব্যাঙ্গের হাসি। আর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ কোন গভীর জীবনবোধের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে হাস্যোদ্রেক ঘটালে কৌতুক রসের জন্ম হয়। উদ্ভট বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিষয়কে অবলম্বন করে পরিবেশিত হয় উৎকল্পনার হাস্যরস।

বাংলা সাহিত্যে আদিযুগ থেকেই সাহিত্যিকরা হাস্যরস পরিবেশন করেছেন-- 'চর্যাপদের' কথাই আমরা ধরতে পারি। ধর্মকেন্দ্রিক সাধনসঙ্গীত রচনার উদ্দেশ্য থাকলেও সামাজিক অসঙ্গতি কবিদের চোখ এড়ায়নি। 'রুখের তেন্ডলি কুম্ভীরে খাঅ' কিংবা দিনেরবেলায় যে বধূ কাকের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে রাত্রিতে সেই কামনা পূরণে বেরিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। এইসব অসঙ্গতির চিত্র চর্যাপদে দেখা যায়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'মঙ্গলকাব্য', পদাবলী সাহিত্য থেকে অনুবাদ সাহিত্যের পাতায় হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে দৈবনির্ভরতার যুগে ভক্তি যেখানে সম্বল সেখানে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সাহিত্য আশা করা অন্যায়। তবুও ব্যক্তি, সামাজিক বিকৃতি, অসংগতি কখনো কৌতুক আবার কখনো বা ব্যঙ্গের আকারে ঝরে পড়েছে। উনিশ শতকের সূচনায় বাঙালির হাস্যরস পরিবেশনের ধারায় পরিবর্তন আসে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসা একদল তরুণ নবচিন্তা চেতনার স্রোতে বিমোহিত। অন্যদিকে রক্ষণশীল সমাজের ভ্রূকুটি। সনাতন, নবীন এই দ্বন্দ্বের কালে স্বাভাবিকভাবেই ব্যঙ্গরসের আমদানি হতে দেখা গিয়েছে। ঈশ্বরগুপ্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হুতোম প্যাঁচা, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসুর রচনায় এই ধরণের হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে এই সময়ই ত্রৈলোক্যনাথ অদ্ভুত হাস্যরস পরিবেশনের মাধ্যমে পাঠকের মন জয় করে নেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ হাস্যরসকে সূক্ষতার স্তরে নিয়ে গিয়েছেন কিন্তু হাস্যরসিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা বা সাহিত্যকর্মকে হাস্যরসাত্মক সাহিত্যরূপে গড়ে তোলা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। এছাড়াও বিশ শতকে বাংলা হাস্যরসের জগতে যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি পাই তাঁদের মধ্যে অন্যতম কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, শিব্রাম চক্রবর্তী, শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত প্রমুখ সকলেই বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তাঁদের নিজস্ব মননে, নিজস্বশৈলীতে।

প্রচেত গুপ্ত এই সময়ের একজন প্রথিত যশা কথাকার। তাঁর জন্ম ১৯৫২ সালের ১৪ই অক্টোবর। ছোটবেলা থেকে লেখালেখির সূত্রপাত। মাত্র বারো বছর বয়সে 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম উপন্যাস 'আমার যা আছে' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে তাঁর বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। সেই সময়ই শিশুদের জন্য লেখা উপন্যাস 'লাল রঙের চুড়ি' প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর উপন্যাসের পাশাপাশি বহু গল্পও রচনা করেছেন। প্রকাশিত হয়েছে গল্পগ্রন্থও। তাঁর সাহিত্যকৃতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সমালোচক রবিন পাল বলেছেন,

> "প্রচেতর লেখা পড়তে ভালো লাগে, তিনি জানেন কিভাবে পাঠকের মন জয় করতে হয়। অথচ পাঠক মন বিরক্ত হয় না, ক্ষুব্ধ হয় না, কোনো বিশেষ টানে চালিত হয় না... আমি প্রচেতর বই হাতে পেলেই পড়ি। প্রথম পাঠে মজা পাই— কোনটা থেকে কম, কোনটা থেকে বেশি।"[৬]

প্রচেতগুপ্তের লেখার একটা মূল্য বৈশিষ্ট্য প্রাবন্ধিকের মন্তব্য থেকে উঠে আসে— সেটি হল প্রথম পাঠে মজা পাওয়ার প্রসঙ্গ। জীবন-যন্ত্রণার বিভিন্ন দিক তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে কিন্তু কোন এক ইতিবাচকতায় লেখক তাকে সমাপ্ত করেন। বিচ্ছিন্নতার সময়েও মানুষের ওপর তিনি বিশ্বাস হারান না, তাঁদের মাধ্যমেই জটিল সমস্যার সমাধান খোঁজেন। সরসতার সঙ্গেই তিনি গল্প বলে চলেন। তাই হাসি তাঁর সাহিত্যের অন্যতম একটি উপাদান। হাসির গল্প রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত হাসির গল্পের একই বাছাই করা সংকলনও তিনি প্রকাশ করেছেন 'বাছাই করা হাসি' নাম দিয়ে। তাই একুশ শতকের হাস্যরসসাহিত্যের তিনি অন্যতম এক প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্বে যে হাস্যরসের ধারা বিচ্ছুরিত হয়েছিল তারপর বহু সাহিত্যিকের লেখনীতে পুষ্ট হয়েছে প্রচেতগুপ্ত সেই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। উক্ত সংকলনের কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে তাঁর হাস্যরসাত্মক রচনার প্রবণতাগুলি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

প্রকৃত হাস্যরসিক জীবনকে তীক্ষ্ণ এবং তির্যক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। জীবনের বাস্তব রূপ সম্পর্কেও তাঁর থাকে সদা-জাগ্রত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। প্রচেত গুপ্তের লেখনীতেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়। সমাজের ব্যাধি এবং ব্যাধিগ্রস্ত চরিত্রগুলি সম্পর্কে তিনি সচেতন। সামাজিক সংকটের বিভিন্নদিক তাই বিভিন্নভাবে উঠে আসে তাঁর

লেখনীতে। এমনি সামাজিক ব্যাধি এবং ব্যাধিগ্রস্ত চরিত্রের বাস্তব রূপহাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, 'বসন্ত জাগ্রত কাকে' গল্পটির মধ্যে। প্রসন্ন সান্যাল সরকারি অফিসের চাকুরে। উপরি রোজগার আছে। আছে উপরি সঞ্চয়। তার একটা অংশ সোনা গয়নার মাধ্যমে রক্ষিত। অফিসের ভিজিলেন্সের সন্দেহের তালিকায় প্রসন্নবাবু রয়েছেন। সেই প্রসন্নবাবুর সংকট ঘনীভূত হল একটি কাকের মাধ্যমে যখন বসন্তের এক মনোরম সকালবেলায় প্রসন্নবাবুর স্ত্রী মায়াদেবীর চুরি হওয়া তিনভরির একটি সোনার হার খুঁজে পাওয়া গেল পার্শ্বস্থ জামরুল গাছের এক শাখায়। প্রসন্নবাবুর অসৎ অর্থোপার্জনের একটুকরো অপ্রকাশিত প্রমাণ উদ্ভটভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়লো। যদিও কাকের হার চুরির একটি বাস্তব সূত্র গল্পে দেখানো হয়েছে, মায়াদেবীর অসাবধানে হার ফেলে রাখা, পরিচারিকা নন্দরানির মাধ্যমে তা চুরি হয়ে পরে সাফাই করার উদ্দেশ্যে বারান্দার পরিত্যক্ত কাঁটার শলা, লাঠি ইত্যাদির মধ্যে লুকিয়ে রাখা এবং সেখান থেকে বাসা বাঁধার উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে লোহার তার ভেবে কাকের সোনার হার সংগ্রহ, তবুও কাকের এই সোনার হার দিয়ে বাসা তৈরির ঘটনাটি বিসদৃশ এবং কৌতুকবহ।

কিন্তু প্রকৃত হাস্যরস নিহিত রয়েছে প্রসন্নবাবু এবং স্ত্রী মায়াদেবীর সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে। সামাজিক দুর্নীতিকে এখানেই গল্পকার হাস্যে রূপান্তরিত করেছেন। ঘুষখোর প্রসন্নবাবু সংকটের মধ্যে পড়ে তাঁর অসৎকাজের শাস্তি ভোগ করছেন— এটিই হাস্যের মূল জায়গা। ব্যঙ্গের চাবুক হাতে করে লেখক শাস্তি বিধান করেন নি বরং দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্রদের কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলে হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টি করে সহানুভূতি জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই বলা চলে গল্পটি একটি হিউমারের উদাহরণ। বহুমূল্য হার ফেরৎ পাওয়ার লোভ, কিন্তু অপরাধ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে চুপ করে বসে থাকার দ্বন্দ্বে চরিত্র দুটি প্রতি মুহূর্তে আলোড়িত হয়েছে। ঘটনা নজরে পড়ার পর দমকল ডাকতে গিয়ে ডাকতে পারছেন না প্রসন্ন বাবু। থানা-পুলিশ, ভিজিলেন্স হয়ে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কা তাঁর সর্বক্ষণ। তাই বাড়ির সকলের ওপর 'স্পিকটি নট' থাকার নির্দেশ জারি করেছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় মায়াদেবী ড্রয়িংরুমে পরিচারিকা নন্দরানীর সাহায্যে চোখ বুঁজে মাথায় আইস ব্যাগ ধরে আছেন। হাসফাঁস করা এই অবস্থা হাস্যোদ্রেককারী এবং সহানুভূতিসূচকও। ঘুষখোরের শাস্তি যেমন প্রসন্নবাবুর ক্ষেত্রে হাস্যোদ্রেকের কারণ ঘুষের পয়সায় দামী অলঙ্কার দেখিয়ে অহঙ্কার প্রকাশের সাজা ভোগ মায়াদেবীর ক্ষেত্রে হাস্যরস উদ্রেকের কারণ। মেজো ননদের ছেলের জন্মদিনে তিনভরির হার পরবার দরকার না থাকলেও লোকের চোখ টাটানোর উদ্দেশ্যে তা পরতে গিয়েই সমস্যার সূত্রপাত ঘটানোর সাজাই তাকে হাস্যকর করে তুলেছে। টেনশনে পড়ে প্রসন্নবাবুর উপলব্ধি—

> "...উপরি রোজগারে আমি আর নেই। কাকেরা ঢের শিক্ষা দিয়েছে। শাস্তিও দিয়েছে বলতে পারো।"[৭]

কাকের মাধ্যমে প্রসন্নবাবুর এই মানবিক উত্তরণ অবশ্যই সহানুভূতি দাবী করে।

তবে গল্পের মধ্যে মধ্যে নির্মল হাস্যরসের জোগান লেখক দিয়েই চলেন। হার চুরি করেও নিজের অধিকারে নিতে না পারা নন্দরাণীর মনে মনে নিজের কপালকে শাপ শাপান্ত---সম্মান রেখে মায়াদেবীকে গাল পাড়া, এবং অবস্থা বুঝে মায়াদেবীর কাছ থেকে ছাপা শাড়ির বদলে তাতের শাড়ির আব্দার হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। বিশেষত, মনে মনে গাল পারলেও প্রাপকের সম্মান বজায় রেখে গাল দেবার বৈপরীত্য তাঁকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিতই করেছে। এ ছাড়াও বাসা থেকে হার উদ্ধার করতে আসা মাতাল মন্মথ, সুনন্দিনীর বিশেষ বন্ধু, নন্দরাণীর স্বামী হরিদাস সায়নের সহপাঠীর দিদি সকলেই সামান্য উপস্থিতির মধ্যেও কৌতুক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রসন্নবাবু, মায়াদেবীর হাতঘড়ির কথা বলে মন্মথকে কাকের বাসায় পাঠাতে চাইলে মন্মথর সরস প্রশ্ন—

> "হাতঘড়ি নিয়ে কাকেরা কী করবে দাদাবাবু? টাইম দেখবে।"[৮]

আবার সায়নের সহপাঠীর দিদি মিনি, ফেসবুক লাইভ শুরু করলে কাকের খপ্পরে তা পণ্ড হওয়ায় হাস্যোদ্রেক ঘটিয়েছে। সুনন্দিনীর হবু বরের, মায়াদেবীর হার বিক্রি করে নিজের শর্ট ফিল্মের টাকা তোলার স্বপ্ন কাকের আক্রমণে এক মুহূর্তে বিনষ্ট হয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি ও অসঙ্গতিকে যেমন লেখক হাস্যরস সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন তেমনই আধুনিক যুবকের শখ পূরণ তথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্খা নিবৃত্তির অসঙ্গত আবদারও প্রকৃত জীবনরসিকের দৃষ্টিতে হাস্যের মোড়কে ব্যক্ত করেছেন।

চরিত্রের কার্যকলাপের পাশাপাশি বুদ্ধিদীপ্ত বাক রীতির ব্যবহারও গল্পে হাস্যরসের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। প্রসন্নবাবুর বাড়ির অবস্থা বোঝাতে, ইলেকট্রিক তারের তুলনা টেনে 'হাইটেনশন বাড়ি' কিংবা মায়াদেবীর দামী গয়না তুলতে ভুলে যাওয়াকে 'বাড়তি সোনাদানা সিনড্রোম', ইত্যাদি উল্লেখের দাবী রাখে। সব থেকে বড় কথা গল্পের নামকরণে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিকৃত ব্যবহার কৌতুকের ইঙ্গিত বহন করে। বসন্ত, প্রসন্ন সমান্তরাল হলেও বসন্তে প্রসন্নবাবুর অপ্রসন্ন রূপ, কোকিলের বদলে কাকের আগমনের বৈপরীত্য কৌতুকের ইঙ্গিতকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। গল্পটি হিউমার হলেও নির্মল কৌতুকের ধারাস্রোত কোথাও ক্ষীণ হয়ে যায়নি— এখানেই হাস্যরসাত্মক এই গল্পটির স্বাতন্ত্র্য।

মানব চরিত্রের অসঙ্গতিকে তুলে ধরতে লেখক কোথাও কোথাও বুদ্ধিবৃত্তিকে উস্কে দিয়েছেন। 'মানুষ চেনা কঠিন'তেমনি একটি গল্প। উপকারীর উপকার মনে রাখা, মানবচরিত্রের কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচায়ক। অথচ বাস্তবজীবনে কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব কম লক্ষ করা যায় না। এই অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করেই এই গল্পটি রচিত হয়েছে। লেখক বেছে নিয়েছেন শহুরে মধ্যবিত্ত চাকুরে নির্মলবাবু চরিত্রটিকে। নির্মলবাবুর চরিত্রের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। অসামান্য বা অসাধারণ হয়ে ওঠার মত বিশেষত্ব নয়, খুবই সাধারণ হলেও এই বৈশিষ্ট্যের আলোকেই চরিত্রটিকে বাইরে থেকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। নির্মলবাবু কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে মাথা ঘামান না। বরং বলা চলে মাথা ঘামাতে পছন্দ করেন না। ঝামেলাহীন সহজ-সরল জীবন যাপন করতে পছন্দ করেন। তাই তাঁর দৈনন্দিন রুটিনটিও সাদামাটা— ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, মর্নিংওয়াক সেরে বাজার তারপর অফিস। অফিস থেকে ছুটির পর সোজা বাড়ি ফিরে পত্র-পত্রিকা বা টিভি দেখে দশটার মধ্যেই আহারান্তে নিদ্রা। এহেন সহজ সরল মানুষটি তাঁর ফেলে আশা অতীতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে চিনে ওঠার, বলা চলে শনাক্ত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কথা আবিষ্কার করেন। এই সংকটের সূত্রের মধ্যেই লেখক কৌতুকের বীজ বপন করে রেখেছেন। প্রাথমিকভাবে সমস্যাটিকে সিরিয়াস বলেই মনে হয়। অন্তত লেখক সেভাবেই কাহিনিতে প্রতিষ্ঠা করেন। নির্ঝঞ্ঝাট নির্মলবাবু কোন বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামালেও এই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন এবং সমাধান না পেয়ে ডাক্তারের দ্বারস্থ হন। সেখানেই ডাক্তারবাবুকে পুরো ঘটনা খুলে বলেন। সেই সূত্রেই তাঁর সমস্যার স্বরূপ পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর কাছে নির্মলবাবু তার বিস্মরণের বেশ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন, যার মধ্যে রয়েছে শিলিগুড়ির অফিসে চাকরি করার সময় সেখানকার ঘনিষ্ঠ রুম-মেট পার্থ হাজারির সঙ্গে অফিস ফেরতা পথে দেখা হলেও কিছুতেই তাকে চিনে উঠতে পারেন না, পরে মনে পড়ে এই পার্থ হাজারিই মেসে থাকার সময় তাঁর জ্বর এলে সেবা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় পড়তে এলে বেকার নির্মলবাবুকে কিছু অর্থসাহায্য করেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু মানিক। দীর্ঘদিন যোগাযোগ না থাকায় মানিকের বোন যখন মানিকের চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য চাইতে এলেন নির্মলবাবু তাঁকেও চিনতে না পেরে বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন। কয়েকদিন পর তাঁর নির্মলের কথা মনে পড়লো। শুধু নির্মল নয়, ছোটবেলায় জলে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে চারু, বারাসাত অফিসের পুরানো পিওন যিনি নির্মলবাবুকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের পা মুচকে ছিলেন সেই সকলের সঙ্গে দেখা হলেও প্রথমে কিছুতেই তিনি চিনতে পারলেন না। অথচ পরে মনে পড়লো তাঁদের কথা। এই সিরিয়াস ঘটনাগুলি প্রকৃত অর্থেই সিরিয়াস থাকে না যখন একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হয়। ঘটনাগুলির মধ্যে একটি মিল লক্ষ করা যায়— যাঁদের ভুলে যাওয়া হচ্ছে তাঁরা সকলেই অতীতকালের চরিত্র এবং তাঁরা কোন না কোনভাবে নির্মলবাবুর উপকার করেছেন। আর নির্মলবাবু শুধু তাঁদের কথাই মনে রাখতে পারছেন না। সূত্রটি অবশ্য ডাক্তারবাবুই ধরিয়ে দেন এবং মানসিক অসুখের তকমায় সমস্যাটিকে আবদ্ধ রাখেন না। যেভাবে পাঠকের সম্মুখে জটিল সমস্যা ঘনিয়ে তোলা হচ্ছিল, ডাক্তারবাবুর পর্যবেক্ষণে তার সরল রূপটি প্রকটিত হয়ে পড়ে। বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের বৈশিষ্ট্যই এই কোন বিষয়ের অবতারণা করে যখন হঠাৎ করে সেই বিষয়ের বিপরীত বক্তব্য উপস্থাপন করে বিষয়টিকে লঘু করে দেন তখনই বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে ডাক্তার চরিত্রটির মাধ্যমে প্রসঙ্গটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ায় 'উইট' কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। সরাসরি পাঠকের বিবেচনার ওপর এই অসঙ্গতি উন্মোচনের জন্য ছেড়ে দিলে এই উইট আরো ভালো জমে উঠতে পারতো। প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর নির্মলবাবু পুরানো লোক চিনতে শুরু করেন, তবে উপকারী ব্যক্তিদের দেখা মেলে না। একই

শ্রেণিতে পড়ার সময় যে চরিত্র তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলতো নির্মলবাবু তাঁকে দেখে চিনতে পারেন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। উপকারীর উপকার ভুলে যাওয়া আর অপকারীর উৎপীড়ন ভুলতে না পারার মধ্যে মানব চরিত্রের যে অসঙ্গতি লুকিয়ে রয়েছে তা বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। সর্বশেষে সহজ সরল নির্মলবাবু নিজের চরিত্রের এই নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে মানুষ চেনা যে সহজ নয় এই আপ্তবাক্যের সত্যতা খুঁজে পেয়েছেন নিজেরই মধ্যে। নির্মলবাবুর এই আবিষ্কার এবং প্রবাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার আনন্দ পাঠকের বোধকে আরো একবার হাস্যের অনুভূতি দান করেছে।

রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজার স্টাইলাস দিয়ে কাসকাকে হত্যা করেছিলেন। সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুও নাকি কলমের আঘাতেই— এ তথ্য আমাদের জানিয়েছেন শ্রীপান্থ তাঁর পঃ বঃ মঃ শিঃ পঃ সঙ্কলিত সঞ্চয়ন 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে। লেখা ছাড়া কলমের ভিন্ন ভূমিকার পরিচয় এখানে পাওয়া গেছে। বলাবাহুল্য ভীতিপ্রদ পরিচয় পাঠককে শিহরিত করেছে। প্রচেতগুপ্তের 'রুটি' গল্পে ক্ষুধা দূরীকরণের উপকরণ রুটির এমনই এক ভিন্ন ভূমিকার প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না রুটির ভূমিকা এখানে ভীতি সঞ্চার করে নি বরং মাজাদার অনুভূতি বহন করে এনেছে। আপাত অর্থে তুচ্ছ দৈনিক একটি বিষয় লেখকের চিন্তাকৌশলে হাস্য সৃষ্টির চমৎকার উপাদান হয়ে উঠেছে এই গল্পে।

কথকের পাড়ার নিতান্ত সাধারণ অপরিচিত একজন মানুষ, নরেনবাবু রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন রুটির জন্য। পাড়ার দোকান থেকে রাতের খাবারের জন্য নিতে আসা রুটি ছুঁড়ে গুণ্ডার হাত থেকে দোকানির মেয়েকে রক্ষা করার অবিস্মরণীয় কীর্তির মাধ্যমেই তাঁর বিখ্যাত হয়ে ওঠা। রুটির এমন অভাবনীয় গুণের পরিচয় দুর্লভ, অদ্ভুতও বটে। রুটির প্রভাব শুধু নরেনবাবুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, এই ঘটনাটিকে কাজে লাগিয়েছে পাড়ার রুটির দোকানটি— নরেনবাবুর ছবির বড়ো হোডিং ছাপা হয়েছে মোড়ে মোড়ে তা টাঙিয়েও দেওয়া হয়েছে সঙ্গে রয়েছে রুটি মাহাত্ম্যের ক্যাপশন। রুটির মাধ্যমে নরেনবাবুর এই ঘটনা কথকের জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। নরেনবাবুর মত বিখ্যাত লোক পাড়ায় থাকার কথা কথক প্রেমিকাকে জানাননি বলে প্রেমিকার ফেসবুকে তিনি আনফ্রেন্ড হয়েছেন, এবং নম্বর ব্লক হয়েছে। রুটির মাহাত্ম্য অনুধাবন করে কথক প্রেমিকার মান ভাঙাতে গোলাপের সঙ্গে কিছু রুটি উপহার দেওয়ার কথাও ভাবতে শুরু করেছেন। রুটি রুজির লড়াই মানুষকে প্রতিনিয়ত লড়তে হয় তার পাশে রুটিকে কেন্দ্র করে জীবনে এখন অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ঘটনায় একদিকের গাম্ভীর্য লঘুতায় পর্যবসিত হয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। এ হাসিতে আঘাত নেই, করুণাও নেই রয়েছে নির্মল হাস্যের ফোয়ারা।

নির্মল হাস্য-রস সৃষ্টিতে কার্য-কারণ সূত্রকে লেখক অস্বীকার করেননি। ফলে অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক কোথাও ছিন্ন হয়ে যায়নি। রুটি ছুঁড়ে গুণ্ডা দমনের মত অদ্ভুত ঘটনাটির ব্যাখ্যা গল্পের মধ্যেই উপস্থাপিত করেছেন, রুটি দিতে আসা নিনির, গুণ্ডার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ওড়না ফেরত চেয়ে চিৎকারকে ভুল করে নরেনবাবু রুটির ফেরত চাওয়া ভেবে জানলা দিয়ে ছোঁড়া রুটি গুণ্ডার জ্ঞান হারিয়ে দেওয়ার নার্ভে পড়েই তাকে কুপোকাৎ করেছে। এহেন ব্যাখ্যা বাস্তবতা বজায় রাখারই প্রয়াস।

নরেনবাবু চরিত্রটির মধ্যে হিউমারের উপাদান রয়েছে। কে নরেনবাবু? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই নরেনবাবুর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি অতিসাধারণ একজন মানুষ। তাই কথক বলেছেন যে নরেনবাবু আসলে কেউই নন। পাড়ার লোক দূর অস্ত পাশের বাড়ির কেউ নরেনবাবুর খবর রাখেন না। খবর রাখার মত লোকও তিনি নন—

> "তিনি সাধারণের সাধারণ, ভীতুর ভীতু, এড়িয়ে যাওয়ার এড়িয়ে যাওয়া।"[৯]

নরেনবাবু এতটাই নির্বিরোধী মানুষ যে দু-একবার চুরি, ছিনতাইয়ের মত ঘটনাও মেনে নিয়েছেন। পকেটমারি করতে এসে নরেনবাবুর পকেটে হাত আটকে গেলে ঝামেলার ভয়ে নরেনবাবু পকেটমারকে হাত বার করতে সাহায্য করেছেন। কেবল অফিসের আইডেন্টিটি কার্ডটি ফেরত চেয়েছেন, পকেটমার তাতে সম্মত না হলে তার আশাও পরিত্যাগ করেছেন। ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়েও নির্বিরোধে দান করেছেন। বাস্তব জীবনের নির্বিরোধী মানুষের অস্তিত্ব থাকলেও

পকেটমারকে ধরতে পেরেও ঝামেলার ভয়ে ছেড়ে দেওয়ার মত নির্বরোধী মানুষ দুর্লভ। নরেনবাবু তাই আজকের যুগের পক্ষে অসঙ্গতিপূর্ণ চরিত্র। এই অসঙ্গতি হাস্যোদ্রেক করলেও নরেনবাবুর মত ভালোমানুষ সহানুভূতিও আদায় করে নেন। যদিও গল্পে মূল হাস্যরসের ক্ষেত্র হিউমার নয় তবুও নরেনবাবুর মত নিরীহ চরিত্রের গুণ্ডা জব্দের ঘটনার বিপ্রতীপতায় নির্মল হাস্যের দমক বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রচলিত কিংবদন্তী জুড়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টাও এই গল্পে দেখা যায়। দিকপাল মনীষীদের কোন নির্দিষ্ট খাবার দোকানে বসে, মাঝে মাঝেই খাবার খাওয়ার ঘটনা লোকের মুখে কিংবদন্তী হয়ে দোকানের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে, এখানে রুটির দোকান 'উনুনে'র ক্ষেত্রেও তেমন কিংবদন্তীকে জুড়ে দিয়ে একটি সংশয়বাচক অব্যয় 'নাকি' ব্যবহার করে সংশয় সৃষ্টি করেছেন। সাক্ষী না থাকায় প্রমাণের অভাবেও এই সংশয় বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সমান তালে চলেছে। সোজা কথায় ঢপবাজের প্রতি যে হাস্য উদ্রেক হয় 'উনুন' সেই হাস্যসূচক হয়েই গল্পে অবস্থান করছে।

সব মিলিয়ে রুটিকে যে লেখক ধনী-নির্ধন, শ্রমজীবী সাধারণ জাতিধর্মকে ছাড়িয়েও যে এক অখ্যাত সাধারণ মানুষের ভিন্ন ক্ষেত্রের লড়াইয়ের উপকরণ করে, আপাত তুচ্ছ ঘটনাকে মহিমান্বিত করেছেন, তার রস একবারে রসিকের মর্মস্থানকে নির্মল হাস্যে প্লাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রচেত গুপ্তের লেখায় এই নির্মল হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

যন্ত্রযুগের ক্রমবর্ধমান জটিলতা মানুষের কাছ থেকে যা যা কেড়ে নিয়েছে হাসি তাদের মধ্যে অন্যতম। শিশু থেকে বুড়ো সকলেই ছুটছেন শৈশব হারিয়ে যেতে বসেছে— সিলেবাস, পরীক্ষা লক্ষে পৌঁছানোর ইঁদুর দৌড়ে। জীবনের অবসরই যেখানে দুর্লভ সেখানে হাসির ফুরসৎ কোথায়! দমবন্ধ নিয়ম বাঁধা এই জীবনের সাধারণ, চারপাশের ঘটনা থেকেই লেখক হাস্যরসের সন্ধান করেছেন নাটক অভিনয়কে কেন্দ্র করে তাঁর বেশ কয়েকটি হাস্যরসাত্মক গল্প লক্ষ করা যায়। পুজো উপলক্ষে নাটকের অভিনয় বাঙালি জীবনের অঙ্গ। তাছাড়া পাড়ার ক্লাবগুলির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই হোক কিংবা স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবকিছুতেই নাটকের আকর্ষণ ভিন্নমাত্রা সঞ্চার করে। বলা বাহুল্য এই নাটকগুলির অভিনয় বিখ্যাত নাট্যদল বা বড়বড় অভিনতো অভিনেত্রীর মাধ্যমে হয় না। পাড়ার অথবা ক্লাবের স্বল্প-নাট্যভিজ্ঞ লোকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই স্থানীয়দের দ্বারাই অভিনীত হয়। তাই উচ্চ অভিনয়, শিল্প-কুশলতা এসবের মধ্যে সব সময় থাকে না। সমগ্র বিষয়টির মধ্যেই বহুল ফাঁক থেকে যায়। সেই অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করেই হাস্যরস পরিবেশন করেছন লেখক।

'রাজার পার্ট' গল্পটি এমনি একটি গল্পের উদাহরণ। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন ক্লাব। পুজো উপলক্ষ্যে অষ্টমীর রাতে তাঁরা নাটক আয়োজন করে। সতেরা বছর ধরে এই ঐতিহ্যই প্রবহমান। নাটক পরিচালনা করেন ক্লাবেরই কল্যাণ দা। নাটক পরিচালনার বিষয়ে অত্যধিক নিয়ম-নিষ্ঠ সারা বছর ধরে তিনি নিজেই নাটক লেখেন। তারপর চলে অভিনেতা বাছাই পর্ব। তার জন্যও রয়েছে নিয়মের আতিশয্য। নাটকের তিন মাস আগে ক্লাবে একটি বাধাই করা বেঁটে খাতা রাখা হয়। সেখানে সকলকে নাম ঠিকানা সহ নাটকে অভিনয়ের জন্য নাম লেখাতে হয়। তারপর একে একে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে অভিনেতা বাছাই করেন কল্যাণ দা। ইচ্ছুক অভিনেতার সংখ্যা দুশো থেকে আড়াইশোর কম হয় না। এতজন প্রার্থীর মধ্য থেকে সঠিক অভিনেতা বাছাই করার ধৈর্য্য, শ্রম, সময় সবটুকুই ব্যয় করেন তিনি। পরিচিতিহীন অখ্যাত চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের জন্য কল্যাণ দা-র এই মাত্রাছাড়া নিয়মনিষ্ঠা স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করে বলে তা হাস্যকর হয়ে ওঠে।

কল্যাণদা রচিত নাটকটিও মজার এবং হাস্যোদ্রেককারী। রূপকথা এবং বাস্তবকে মিশিয়ে এক কিম্ভুত কিমাকার চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে নাটকের জন্য। উদ্ভট, অদ্ভুত ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে যে হাস্যরসের উদ্ভব ঘটে তা অজানা নয়— নাটকটির গল্পের মধ্যে রয়েছে এমনই উদ্ভটত্বের ছোঁয়া। নাটকে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজাকন্যা সকলেই উপস্থিত। কিন্তু তারা কেউই রূপকথার জগতের মত নন। কেননা রাজার কানে রয়েছে মোবাইল, রাজকুমার ফেসবুকে সক্রিয়, রানিমা সিরিয়াল দেখতে অভ্যস্ত, রাজকন্যা মে-আপ বক্স নিয়ে ঘোরেন, মন্ত্রীরা ল্যাপটপ ব্যবহার করেন রাজসভার

গায়কেরা গিটার বাজায়। রাজা হাতির পিঠে চেপে বার হন। কিন্তু এই হাতির সামনে বাজে সাইরেন আর মাথায় লাল আলো। বিষয়টি উদ্ভট হলেও একটি সঙ্গতিসূত্র এর মধ্যে রয়েছে— রাজা-রাজরারা ধনী, ক্ষমতাবাবান, সকল সুযোগ সুবিধাভোগী এবং সমাজের উচ্চকোটিতে তাঁরা অবস্থান করেন এমনটাই সকলে দেখে অভ্যস্ত। এই নাটকের সময় এবং ভোগ্যবস্তুর ক্ষেত্রে একটা গোলমাল থাকলেও নাটকের রাজারা যে ক্ষমতাসূত্রে ভোগ বিলাসময় জীবন যাপন করে তা স্পষ্ট। প্রত্যেকেই নিজের সুখী জীবন নিয়ে ব্যস্ত। অথচ কাহিনি কিছু দূর অগ্রসর হলে রাজপরিবারের এই স্বাভাবিক সঙ্গতি-সূত্র ভেঙে যেতে দেখা যায়। দেখা যায় রাজার মোবাইলে সিগন্যাল নেই, মন্ত্রীর ল্যাপটপে সফটওয়্যার কাজ করছে না, ইন্টারনেটের দুর্বলতার জন্য রাজকুমার ফেসবুক করতে পারছে না, রাজকন্যার লিপস্টিক কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। চ্যানেল না আসায় রাণিমাও বিরক্ত। রাজপরিবারের এই ছন্দোপতন বিসদৃশ, আর তা হাস্যকর। সাধারণের চোখে এই পতন দুঃখজনক নয়। শোষিত মানুষের রক্তেই রাজার ভোগ-বিলাস নির্বাহ হয়। রাজার সেই ভোগ-বিলাসময় জীবনের ব্যাঘাত সাধারণের কাছে দুঃখের কারণ হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধের একটি উক্তি এখানে স্মরণ করা যায়,

> "আমরা বলিয়াছিলাম কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে সেই পীড়াটা অতি অধিক মাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি।"[১০]

রাজার জীবনের সঙ্কট এই হাসির কারণ একথা বলা যায়। গল্পের শেষে দেখা যায় রাজা সিদ্ধান্ত নেন উক্ত ভোগ্যবস্তুগুলির জন্য তিনি আধুনিক সময়ে চলে যাবেন— তাতে তার রাজত্ব থাকুক আর নাই থাকুক। একজন রাজার যন্ত্রযুগের আকর্ষণে রাজত্ব ছেড়ে দেওয়ার মত অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আরো একবার হাস্যোদ্রেক ঘটে এবং মজার পরিসমাপ্তি সূচিত হয়। বলা বাহুল্য ঘটনাটি নির্মল হাস্যরসাত্মক।

কিন্তু সেই কল্যাণদা পুজোর কয়েকদিন পূর্বে নাটক পরিচালনা থেকে অব্যাহতি চান। এটি গল্পের মূল সংকটের জায়গা। সমস্যা সৃষ্টির কারণ, এবং তার থেকে সমাধানের মধ্যেই লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। জমজমাট নাটকে লিখলেও, কল্যাণদা নাটকের জন্য রাজার চরিত্রে অভিনয় করে এমন সুযোগ্য অভিনেতা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, সে খবর রটে গেলেই সংকট ঘনীভূত হতে শুরু করে। দেখা যায়, যারা প্রথমদিকে কল্যাণদার কাছে এই চরিত্রের জন্য বাতিল হয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই মিষ্টির বাক্স হাতে করে অনুরোধ জানাতে আসে। পাড়ার নেতা চিঠি লিখে তাঁর ভাইপোকে রাজার পার্ট দেওয়ার অনুরোধ জানান, শুধু নেতা নন, থানার ওসি তাঁর শ্যালককে রাজার পার্টে অভিনয়ের বদলে চুরি ডাকাতির কবল থেকে মুক্ত থাকার অভয় দিয়ে প্রস্তাব পাঠান, রাত-বিরেতে অনেকে টেলিফোন করে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের জন্য রাজার পার্ট প্রার্থনা করেন। এখানেই শেষ নয় পাড়ার ভণ্ডুরামজি জমকালো পোশাকে অস্ত্রহাতে সোজা পরিচালকের বাড়ির সামনে তাকে না পেয়ে সন্ধ্যা থেকে পায়চারি করতে থাকেন, আর কল্যাণদার বৃদ্ধা মা বাড়ি ফেরার সময় কিম্ভুত ভণ্ডুরামজিকে ভূত ভেবে রিকশা থেকে পড়ে পা মচকে ফেলেন। মানুষের পতন এবং আঘাত লাগা হাস্যকর ঘটনা হতে পারে না। কল্যণদার মায়ের এই পতন এবং আঘাত কিন্তু নির্মল হাস্য সৃষ্টি করে। ভণ্ডুরামজির অদ্ভুত পোশাকে অপ্রত্যাশিত আগমনের প্রেক্ষিতে এই পতন সংঘটিত হয় বলে পতনের গাম্ভীর্য এখানে লঘুতা প্রাপ্ত হয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই নাটক পরিচালনা করতে গিয়ে কল্যাণদাকে সে উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে তার স্বল্পতা সহানুভূতির বদলে হাস্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

কল্যাণদার সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এল চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের সদস্যরা। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কল্যাণদার বাড়ি ঘিরে বসলো লাঠি হাতে পাহারা। দু-একজন, যারা রাজা হতে কল্যাণদার বাড়ি এল লাঠি হাতে ক্লাবের সদস্যদের এগিয়ে আসতে দেখে তারা কুপোকাৎ। খবর রটে যাওয়ায় রাজা হওয়ার আগ্রহ কমে আসতে লাগলো। দু-একদিনের মধ্যেই কল্যাণদা সমস্যা থেকে মুক্তি পেলেন। পাড়ার ক্লাবে নাটক পরিচালনা করতে গিয়ে অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কল্যাণদার কাছে অনুরোধ উপরোধের সংখ্যা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল আর তা সমাধানের জন্য বলা ভালো সুষ্ঠুভাবে নাটক সম্পন্ন করার জন্য যেভাবে লাঠি হাতে অভিনয় ইচ্ছুক জনতাকে ঠেকাতে পাহারা বসিয়েছে তা একেবারে অভিনব। বাস্তবে এমন ঘটনা সত্যিই অদ্ভুত। আর অদ্ভুত বলেই তা গল্পের হাস্যরসকে জমিয়ে রাখতে সক্ষম

হয়েছে। সূচনা থেকে হাস্যের আভাস এবং শেষ পর্যন্ত তা বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্মল হাসির দমক রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক।

নাটক-কেন্দ্রিক দ্বিতীয় হাস্যরসাত্মক গল্পটি হল 'ভূদেব স্যারের ভুল'। গল্প-কথকের স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক ভূদেববাবু। প্রতিবছর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর ছাত্ররা নাটক অভিনয় করে। পরিচালনায় থাকেন ভূদেববাবু। কল্যাণদার মতোই ভূদেববাবু নিজেই নাটক লেখেন, পরিচালনাও করেন। অইভনেতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও তিনি কল্যাণদার মতোই কড়া পরীক্ষা নেন। নাটক পরিচালনা করেন বলেই কল্যাণদার মতোই ভূদেববা ুকেও উপরোধের উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপরোধের প্রসঙ্গও গল্পে উল্লিখিত হয়েছে। তবে এখানে অনুরোধ আসে মূলত ছাত্রদের বাড়ির আত্মীয়দের কাছ থেকে। প্রথম উপরোধটির ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্লাস এইটের এক অভিভাবক তাঁদের ছেলেকে নাটকে নেওয়ার জন্য নরমপাকের সন্দেশ হাতে করে ভূদেববাবুর কাছে উপস্থিত হন। ছাত্রের পিতা নাটকে নেওয়ার অনুরোধ জানান আর ছাত্রের মা ছাত্রকে নাটকে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন। ছাত্রের সহপাঠী নাটকে সুযোগ পাওয়ার দরুণ তাঁর আত্মীয়েরা বাইরে থেকে নাটক দেখতে আসেন, এক্ষেত্রে ছাত্রের আত্মীয় থাকা সত্ত্বেও ছাত্র নাটকে সুযোগ না পাওয়ায় মা তাঁদের ডাকতে পারেন না বলেই তাদের উপরোধ। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে ছাত্রটির বাবাই ছাত্রের অভিনয় দক্ষতা নিয়ে বলতে গিয়ে পার্ট মুখস্থ রাখার অক্ষমতার কথা জানিয়ে রেখেছেন। দ্বিতীয় উপরোধটি এসেছে ভূদেব স্যারের মামার বন্ধুর কাছ থেকে তাঁর ভাইপোকে নেওয়ার জন্য। ভাইপোর সমস্যা স্টেজে উঠলে ভয়ে পা কাঁপে। বাজারের মধ্যে ভূদেববাবুর হাত জড়িয়ে ধরে ছোটবেলার স্মৃতি উস্কে দিয়ে তিনি অনুরোধ করেছেন। চতুর্থ অনুরোধটি এসেছে ক্লাস এইটের এক ছাত্রের দাদার কাছ থেকে। চলন্ত বাসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে ভূদেববাবুকে অনুরোধ জানিয়েছে তার ভাইয়ের জন্য। তবে ভাইয়ের একটা সমস্যা হল নাটকের পার্ট করার সময় সে হাত-পা নাড়তে ভুলে যায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটির অনুরোধের মধ্যে রয়েছে আতিশয্য। স্বাভাবিক জীবনে সকলের সব বিষয়ে সমান দক্ষতা থাকে না। না থাকাটা কোন অপরাধও নয়। অথচ এইসব চরিত্রেরা নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা জেনেও কোন এক ইঁদুর দৌড়ে সামিল হতে চাইছেন। তাই সামাজিকতা, সৌজন্যের সীমারেখাটুকুও বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছেন না। অনুরোধ উপরোধের এই অতিরেকই তাঁদের এবং তাঁদের কার্যকলাপকে হাস্যরসাত্মক করে তুলেছে।

পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভূদেববাবু নাটকে কিছু বদল আনলেন। বদলের কৃত্রিমতা হাসির দমককে অব্যাহত রেখেছে। নাটকে ছাত্রদের আগ্রহএবং অক্ষমতার প্রসঙ্গ মনে রেখে তাদেরকে সুযোগ করে দিতে ভূদেববাবু কিছু চরিত্র তৈরি করলেন যাদের ভূমিকা স্টেজেই সীমাবদ্ধ রইলো। তাদের পার্টও বলতে হবে না, হাত-পা নাড়তেও হবে না। রাজ-মহারাজাদের নিয়ে লেখা এই নাটকে তাদের মৃত সৈন্য হিসেবে দেখানো হবে। দেখা গেল মাত্র বারো জন সৈন্যের জন্য একশো বারোজন ছাত্রের নাম জমা পড়লো। শেষ পর্যন্ত লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত বাছাই সম্পন্ন হল। অভিনয় দক্ষতা ছাড়াই নাটকে অংশ নেওয়ার জন্য ছাত্রদের এই হুড়োহুড়ি অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু ভূদেব স্যার একটি ভুল করে ফেললেন। সেই ভুলের সূত্র ধরেই গল্পে চূড়ান্ত হাস্যরসাত্মক জায়গাটি তৈরি হয়েছে। মৃত সৈনিকদের দাবি ছিল তারাও অন্যান্য চরিত্রদের মত রোজ রোজ ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রিহার্সাল দেবে। কিন্তু ভূদেব স্যার তা করতে দিলেন না। নাটকের শুরুটা ঠিকঠাকই ছিল। কিছু সময় পর দেখা গেল এক অভাবনীয় ঘটনা— মৃত সৈন্যদের কাছ থেকে 'চটাস্ চটাস্' করে আওয়াজ আসতে শুরু করল - প্রথমে অল্প, তারপর বেশি। অল্প আলোয় মশাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে তাদের এই পদক্ষেপ। তাছাড়া ভূদেব স্যার ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকতে বলেছিলেন। মশা মারায় তো আর নিষেধাজ্ঞা ছিল না। মাঝপথে স্টেজের পর্দা নামাতে হল। কিন্তু তারপরেও দেখা গেল সকলেই উঠে গেলেও নিদ্রাদেবীর কোলে শয্যা নিয়েছেন। এমন ভ্রান্তি সমগ্র ঘটনাটিকেই হাস্যরসাত্মক করে তুলেছে। বলাই বাহুল্য এই হাস্যরসে কারুণ্য নেই, নেই বুদ্ধিরদীপ্তি, তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, যা আছে তা হল প্রাণখুলে হাসি- নির্মল হাস্য।

'নাটক' গল্পটিও নাটক-কেন্দ্রিক আরো একটি হাস্যরসাত্মক গল্প। পাড়ার প্যাণ্ডেলে পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবছর এই নাটক অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও কল্যাণদার মত রয়েছেন মানাদা। তিনিও নিজেই নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন। তবে একটি ব্যাপারে কল্যাণ দা এবং ভূদেব স্যারের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য লক্ষণীয়— অভিনয়ের জন্য উৎসাহীদের যে উৎপীড়ন তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে, মানাদা সে ব্যাপারে ভাগ্যবান। অবশ্য এ ঝামেলা মেটানোর জন্য মানাদা এক অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সকলকে জড়িয়ে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা থাকার জন্য সকলের জন্য নাটকের চরিত্র নির্মাণ করে নিতেন তিনি। উৎসাহীদের জন্য বিভিন্ন খাত তৈরি করা হত, যেমন— অভিনয় খাত, ধার করা খাত, পলিটিক্যাল খাত, চাঁদা খাত, বিক্ষুব্ধ খাত ইত্যাদি। উৎসাহীদের অবস্থা প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে তাদের রাখা হত এবং প্রয়োজনমত চরিত্র বানিয়ে বিভিন্ন খাত থেকে উৎসাহীদের অভিনয় বরাদ্দ করা হত। সকলেই কম-বেশি সুযোগ পাওয়ায় কল্যাণদা বা ভূদেব স্যারের মত অনুরোধের অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়নি। অভিনয়কে কেন্দ্র করে এমন আয়োজন অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে, সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই বিষয়টিও হাস্যরসপূর্ণ।

এই গল্পে হাস্যরস সৃষ্টির মূল চরিত্র একজন ভিখিরি। মানাদার নাটকে মূল চরিত্র হিসেবেই রাখা হয়েছে তাঁকে। মানাদার ইচ্ছে একজন সত্যিকারের ভিখিরিকে দিয়ে ওই পার্টে অভিনয় করাবেন। সেজন্য পাড়ার সাটু ভিখিরিকে নির্বাচন করা হয়েছে। সাটু ভিখিরির চরিতরে একটি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে—

"সাটুর বিশেষত্ব হল, ভিক্ষে গ্রহণকে সে সর্বদা ধারবাকির পর্যায়ে রাখে।"[১১]

যার কাছ থেকে যাই নিকনা কেন, তা ফেরৎ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। দেওয়া নেওয়ার মধ্যে কোনরকম আবেগ, ভালোকথা ইত্যাদিকে সে স্বীকার করে না। কপাল মন্দ বলে সবাই ভিক্ষা করলেও সাটু বলে কপাল ভালো বলেই চুরি ডাকাতি ছেড়ে সে ভিক্ষা করে। মানাদার উদাসীন প্রকৃতির এই সাটুকেই তাঁর নাটকে অভিনয় করাবার প্রবল ইচ্ছে। তাই তিনি যখন সাটুকে নাটকে অভিনয় করবার প্রস্তাব দিলেন তখন মজার কতগুলি কাণ্ড ঘটলো। প্রথমে সাটু রাজি হল না। অভিনয় করতে সাটু রাজি, আসলে রাজি নয় ভিখারির পার্ট করতে। সে আসলে রাজার পার্ট করতে চায়। আপাত অর্থে ভিখারি, রাজার এই বৈপরীত্য হাস্যরস সৃষ্টি করলেও, এর মধ্যে রয়েছে ভিখারি জীবন থেকে সাটুর উত্তরণের স্বপ্ন, ফলে এই হাসি কারুণ্যে সজল। মানাদা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, যে ভিখিরির পার্ট বলে তার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়, কিন্তু তাতেও সাটু রাজি হয় না, উল্টে রাজার পার্ট জুড়ে দেবার আবদার জানায়। এই আবদার বালখিল্যতার নিদর্শন। সাটুর এই বালখিল্য আবদার হাস্য সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত খাবারের বন্দোবস্ত জেনে নাটকে পার্ট করতে সে রাজি হয় কিন্তু একটি শর্ত সে রাখে। ভিখারির পার্ট হলেও কোন পরিশ্রমের কাজ সে করতে পারবে না বলে জানায়। পরিশ্রম করবে না বলেই না সে বাস্তবে ভিখারি আর নাটকে যদি তাকে সে পরিশ্রমই করতে হল তাহলে তাঁর ভিখারিত্বের কী দশা হবে! এইসব অদ্ভুত কার্যকলাপের মাধ্যমে সাটু যেন ভিখারি জীবনকেও একটি গরিমা দিয়েছে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে ভিখারির সেই বৈপরীত্য তথা অসঙ্গতি তাই প্রথম থেকেই হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। তবে হাস্যরসসৃষ্টির চূড়ান্ত মুহূর্ত এসেছে তখন, যখন মঞ্চে অভিনয় চলাকালীন প্রথম দৃশ্যে জমিদারবেশী গোপালবাবুর থেকে সে অর্থ নিয়েছে, আর নাটকে এমন কোন অংশের অবতারণা না থাকলেও সেই অর্থ সে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। গোটা বিষয়টিই নাটকের মধ্যে অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে। গল্পের মূল হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রও এই অংশটি। এই ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে বাস্তব জীবনে গোপালবাবুর কাছে সঠিক ব্যবহার না পেয়ে তাঁর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের সদ্ব্যবহার। স্থান, কাল, পাত্র ভুলেগিয়ে সাটু নাটক থেকে বিচ্যুত হয়ে বাস্তব জগতে প্রবেশ করেছে। ভিক্ষা হিসাবে বেশ কিছু টাকা জমায় সে গোপালবাবুর টাকা ফেরৎ দিতে চেয়েছে, আর গোপালবাবু নাটক ম্যানেজ করতে সেই টাকা ফেরৎ না নিতে চাইলে সাটু মানাদাকে ডেকে ঝামেলা তৈরি করার হুমকি দিয়েছে। গোপালবাবুর অপরাধ বাস্তবে সে দু-বার সাটুকে যে টাকা ভিক্ষা দিয়েছে, তা ছেঁড়া বলে চলেনি। তুচ্ছ অপরাধে সাটু স্থান, কাল, পাত্র ভুলে যে আচরণ করেছে তা অসঙ্গত। শুধু তাই নয় গোপালবাবু শেষ চেষ্টা করে, স্বর্গে নিজের পুণ্য অর্জনের জন্য ভিক্ষা নেওয়ার কথা বললে সাটুর আক্রমণ তীব্র হয়েছে সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে গোপালবাবুর স্বর্গলাভে তাঁর যে কোন বিশেষ সুবিধে নেই সেকথা জানিয়ে মঞ্চে সকলের সামনেই সেই টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্য গোপালবাবুকে ঘিরে ধরেছেন। এতে গোপালবাবুর প্রকৃত মুখোশ

উন্মোচিত হয়েছে। বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও দয়া দেখানোর ভণ্ডামিকে সাটু যেভাবে উন্মুক্ত করেছে, সেই হাস্য বুদ্ধিকে নাড়া দিয়েছে। বাস্তবের ভিখারি যদি সত্যিই জগতে রাজার পার্ট পায়, তাহলে ভণ্ডামির এহেন পরিণতি অবশ্যম্ভাবী একথা সাটু হসির মাধ্যমে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রচেত গুপ্ত ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের শিল্পী নন। তাঁর গল্পে নির্মল হাস্যরসের প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। কোথাও আবার হাসির মধ্যে রয়েছে সহানুভূতির স্পর্শ কোথাও বা বুদ্ধিদীপ্তির ছোঁয়া। তবে তাঁর বেশিরভাগ গল্পে স্মিতহাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের শেষে পাঠক তৃপ্তি বোধ করেন। সেই তৃপ্তিতে স্মিত হাস্য সঞ্চারিত হয়। কৌতুক বোধ এবং পরিণাম-রমণীয়তার এই বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম হাস্যরসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রচেতগুপ্তের নৈকট্যকে প্রমাণ করে। 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পে বিপত্নীক অন্নদা একসময় যে কন্যাকে বিবাহে অস্বীকৃত হন ঘটনাচক্রে সেই কন্যাটিই হয়ে ওঠেন তাঁর কাম্য এবং আকাঙ্খার নারী এবং শেষে তাকেই বিবাহে স্বীকৃত হন। রমণীয় পরিণতির, প্রচেত গুপ্তের এমনি একটি গল্প 'ক্যালকুলাস কন্যা' পাত্র, স্থান, কাল বদল হলেও মালিনীর বিবাহ সংক্রান্ত চাওয়া-পাওয়ার মিলনে গল্পটি প্রভাতকুমারের গল্পের আস্বাদ অনেকাংশেই বহন করে। দুই গ্রামের রেষারেষিকে কেন্দ্র করে, প্রভাতকুমারের 'মাস্টার মহাশয়' গল্পে যে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে প্রচেতগুপ্তের 'নামকরা' গল্পটিতে তেমনি আবহে ভিন্ন প্রসঙ্গে হাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল সময়ের পার্থক্য, পাত্র-পাত্রীর বদল লক্ষ করা যায়। প্রাপ্ত-বয়সক মানুষ থেকে কিশোর, যুবক-যুবতী প্রচেত গুপ্তের হাস্যরসের জগৎ নির্মাণ করেছে। বাঙালির আর্থ-সামাজিক অবস্থান যেমন তাঁর বিবেচ্য বিষয় তেমনি কৈশোর যৌবনের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের প্রীতিময়তার মধ্যে তিনি কৌতুকরসের অনুসন্ধান করেছেন। এবং তাঁর গল্পের হাস্যরস মূলত ঘটনা নির্ভর। এই বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বঙ্গসাহিত্যে অপর এক বিখ্যাত হাস্যরসাহিত্যিক 'দাদামশাই' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায়। শৈশবে লেখালেখির সঙ্গে সংযোগ থাকলেও বিয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রচেতগুপ্ত সাহিত্যের বৃহৎ আঙিনায় প্রবেশ করেন। ব্যক্তিগত কারণে কেদারনাথকে দীর্ঘদিন সাহিত্য জগৎ থেকে বিরতি নিতে হয়েছিল। চাকরি থেকে অবসরজীবন যাপনের সময় তাঁর সেই সাহিত্যিক প্রতিভা স্ফুরিত হতে শুরু করে। কেদারনাথের চরিত্ররা কেরাণি, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে গল্পের হাস্য সৃষ্টি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'ভগবতীর পলায়ন' গল্পটির কথাই উল্লেখ করতে পারি, দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামের তরুণের উন্মাদনা সেই সূত্রে ধূমপান করতে গিয়ে ধরা পড়া, পাঠশালা ছুটির পর অভিনয় করতে করতে বাড়ি ফেরার সময় সকলকে ভয় পাওয়ানো এবং ভগবতী নামক একটি গাভীকে উদ্ধার করে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে যে সব কার্যকলাপের আয়োজন করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি ঘটনাই গল্পে হাস্যরস সঞ্চার করেছে। তবে কেদারনাথের সঙ্গে প্রচেতগুপ্তের লেখনীর পার্থক্য হল কেদারনাথ মজলিশি ঢঙে গল্প বলেন, কারুণ্যমিশ্রিত হাস্যরসই কেদারনাথের রসরচনার প্রধান জায়গা দখল করে আছে, সেখানে প্রচেতগুপ্ত বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে হাস্যরস পরিবেশন করেন হিউমার, উইট থাকলেও নির্মল হাস্যরসের প্রাধান্যই অধিক লক্ষ্য করা যায়। আর এই প্রসঙ্গেই অপর এক হাস্যরসসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উঠে আসে। মূলত পারিবারিক ও আড্ডার অনুষঙ্গে তাঁর লেখায় হাস্যরসের আমদানি হয়েছে। জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা, প্রীতির বন্ধন থাকলেও অসঙ্গতি দুর্লভ নয়---বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সেই অসঙ্গতিকে অবলম্বন করে হাস্যরস পরিবেশন করেন। প্রচেতগুপ্তের মত তাঁর সাহিত্যেও ব্যঙ্গের ঝাঁঝ লক্ষ করা যায় না। 'বরযাত্রী' গল্পটির কথাই উল্লেখ করা যায়— কয়েকটি চরিত্র তাদের সামাজিক কার্যকলাপের অসঙ্গতি থেকেই নির্মল হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। প্রচেতগুপ্তের নির্মল হাস্যরসাত্মক গল্পে সামাজিক সম্পর্ক এবং কার্যকলাপের অসঙ্গতি প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বোপরি যন্ত্রযুগের জটিলতা এই শতকে মানুষের মনকে যেভাবে গ্রাস করেছে, মানসিক ব্যাধি তাকে আক্রান্ত করেছে সেখানে এই নির্মল হাস্যরস জীবনযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত মানুষকে কিছুটা স্বস্তির বাতাস প্রদান করতে সক্ষম হয়। আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ নয়, মানবজীবনের প্রতি সহানুভূতি এবং কৌতুকের আনন্দে তাঁর গল্পগুলি স্বতন্ত্র্য স্থান অধিকার করে, এখানেই গল্পগুলির সার্থকতা।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, অজিত কুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত এবং অনূদিত), ভরত, 'নাট্যশাস্ত্র', প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪, পৃ. ১৪৪
৩. মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর, 'কাব্যতত্ত্ব-বিচার', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ১০৯
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত এবং অনূদিত), ভরত, 'নাট্যশাস্ত্র', প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪, পৃ. ১৪২
৫. ঘোষ, অজিত কুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১
৬. পাল, রবিন, 'ঝিলডাঙার কন্যা - প্রচেত গুপ্তর একটি অনবদ্য উপন্যাস', সমীর ভট্টাচার্য (সম্পাদক), 'পরবাস', সংখ্যা-৬৪, সেপ্টেম্বর ২০১৬, https://www.parabas.com
৭. গুপ্ত, প্রচেত, 'বাছাই করা হাসি', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১৯
৮. তদেব, পৃ. ১৭
৯. তদেব, পৃ. ৪৯
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'পঞ্চভূত', বিশ্বভারতী সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, পৃ. ১৩০
১১. গুপ্ত, প্রচেত, 'বাছাই করা হাসি', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২৩০